রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ব্যক্তিগত সম্পর্কের সন্ধানে

- শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক অসাধারণ গুণগত পরিবর্তন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয় এবং বিংশ শতাব্দীতে পরিপূর্ণতা অর্জন করে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের দরবারে প্রথম সসম্মান স্বীকৃতি অর্জন করে বলা যায়। সাহিত্য ও ভাষার এই অগ্রগতিকে পরস্পরের সম্পূরক হিসেবেই দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে সব ভাষাবিদ্ , লেখক ও সাহিত্যিক - বিশেষত কাব্য-সাহিত্যিক এই পরিবর্তনের পুরোধা ছিলেন তাঁদের বেশীর ভাগই অল্প-বিস্তর "রবীন্দ্র-বলয়ের" অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। যাঁদের সাহিত্যসৃষ্টিতে স্বকীয়তার ছাপ স্পষ্টতর তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম অগ্রগণ্য বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের মত নজরুলেরও বিচরণ সাহিত্য ও সঙ্গীতের বহুতর সরণিতে। নজরুল ছাড়া অন্য কোনও বাঙ্গালী সাহিত্য ও সঙ্গীতস্রষ্টা এত বিচিত্র পথে রবীন্দ্রনাথের সহগামী বোধহয় হতে পারেন নি। এ কথা অনুধাবন করেই হয়ত রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে এক বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহের চক্ষে দেখতেন।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল, আপাতদৃষ্টিতে এই দুই কবি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ। বয়েসের হিসেবে দু জন দুই প্রজন্মের। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১-তে , নজরুলের ১৮৯৯। একজন সুপরিচিত, অভিজাত, সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের সন্তান ; অন্যজন অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্র পরিবারের "অভাগা", যাঁর ডাকনাম দুখুমিয়া ! তাই নজরুলের সাহিত্য প্রতিভার ব্যাপ্তি ও গভীরতা , তাঁর উদার সমাজ-সচেতনতা এবং বিদ্রোহী রাজনৈতিক ভূমিকা বিশেষভাবে বিস্ময়কর।

প্রসঙ্গত এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে নজরুলের সাহিত্যজীবনের বিস্তৃতি মাত্র দুই দশকের মত , রবীন্দ্রনাথের ছয় দশকেরও বেশী। নজরুলের এই বহুমুখী প্রতিভা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন চারিত্রিক দৃঢ়তাকে রবীন্দ্রনাথ সস্নেহ এবং সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ও অভিবাদন জানিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। নজরুলও এই সর্বজন-শ্রদ্ধেয় মানুষটিকে গুরুর আসনে বসিয়ে শুধু তাঁর সাহিত্যই নয়, তাঁর জীবন-দর্শনের থেকেও অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছেন। এই প্রবন্ধে আমি স্বল্প পরিসরে এই দুই বাঙ্গালী মনীষীর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কিছু তথ্য নিবেদন করতে চেষ্টা করছি।

এই দুই বাঙ্গালী কবি দেশ ও সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি এবং চিন্তাধারার দ্বারা একদিকে যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি জীর্ণ-পুরাতনকে বদলে যুগোপযোগী , নুতন এবং কুসংস্কারমুক্ত চিন্তাধারা নিয়ে আসার কাজেও তাঁরা ছিলেন সচেতন এবং উদ্যোগী। এই দিক থেকে তাঁরা একই পথের পথিক। তরুণ বয়সে শিল্পস্রষ্টা, ভাবুক-কবি রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনদর্শন এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন – "না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে / মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে / কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে / মাগিছে তেমনি সুর। কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা / কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা / বিদায়ের আগে দু-চারিটা কথা / রেখে যাব সুমধুর ।।" কবিসুলভ সহজ-সুন্দর, কিন্তু গভীর আকাঙ্খা। বাঙ্গালীমাত্রই মনে প্রাণে জানবেন রবীন্দ্রনাথ এই প্রকাশের ব্যথা মেটাবার প্রতিশ্রুতি তাঁর বিশাল সাহিত্য-সৃষ্টিতে, চিঠিপত্রে, এমন কি তাঁর দৈনন্দিনের কথোপকথনের মাধ্যমে কতটা পালন করে গেছেন।

অন্যদিকে যুবক নজরুলের কঠোর জীবনসংগ্রাম তাঁকে যে শিক্ষা দিয়েছে তার থেকে তিনি হয়ে উঠেছেন বিদ্রোহী। তাঁর জীবনদর্শন তিনি জানালেন বিপ্লবীর ভাষায় – "মহাবিদ্রোহী রণ ক্লান্ত / আমি সেই দিন হব শান্ত / যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না। অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ - ভীম রণভূমে রণিবে না ।।" সংবেদনশীল বাঙ্গালী নজরুলের এই প্রতিশ্রুতিরও উৎস এবং তাৎপর্য বুঝতে পারবেন।

দীর্ঘ কর্মব্যস্ত জীবনে রবীন্দ্রনাথকে বহুবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। তিনি ভাবুক কবি-সাহিত্যিকের ভূমিকার বাইরে এসে দেশের প্রতি এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি তার নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে বার বার অগ্রণী হয়েছেন। নজরুল রাজনীতির জগতের এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলেন, তাই তাঁর বিপ্লবী জীবনদর্শন তাঁর রাজনৈতিক কাজ কর্মের পরিপূরকই ছিল।

আসল প্রসঙ্গে আসা যাক্। ঠিক কখন রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের প্রথম সাক্ষাত হয় তা নিয়ে মতের বিভিন্নতা আছে , তবে তরুণ বয়সে নজরুল রবীন্দ্রনাথের গান এবং কবিতা সভা-সমিতিতে গাইতেন বা আবৃত্তি করতেন, এ কথা সমসাময়িক অনেকে বলেছেন। ১৩২৮ (১৯২১) সালের তেসরা আষাঢ় নজরুলের প্রথম বিয়ে হয় কুমিল্লার নার্গিস আসার খানম নামের এক মহিলার সঙ্গে। এই বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুই লাইন – "জগতের পুরোহিত --তুমি যে জগত মাঝারে / এক চায় একেরে পাইতে / দুই চায় এক হইবারে " -- ব্যবহার করা হয়েছিল দেখা যায়।

কবি সত্যেন দত্ত রবীন্দ্রনাথকে বর্ণনা করেছিলেন "বঙ্গের

মাথার মনি, ভারতের বৈজয়ন্ত হার" বলে । তিনি সারাদেশে "গুরুদেব" বলে পরিচিত , তাই সুদূর গ্রামের ছেলে নজরুলও যে তাঁর ভক্ত হবেন এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও যে এই অজানা কবিযশোপ্রার্থীর কবিতার সঙ্গে শুধু পরিচিতই ছিলেন তাই না , তাঁর গুণগ্রাহীও ছিলেন তার খবর পাওয়া যায় সত্যেন দত্তের সঙ্গে নজরুলের প্রথম দিকের পরিচয়ের একটি বর্ণনায় । সত্যেন দত্ত কলকাতায় তাঁর নিজের এবং নজরুলের বন্ধু গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে নজরুলকে জানান যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে নজরুল সম্বন্ধে খবর নিয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে তিনি নজরুলের "আশা" কবিতাটি (যার শেষের স্তবকটি এই রকম –"বনের ফাঁকে দুষ্টু তুমি / আসবে যাবে নয়না চুমি / সেই সে কথা লিখছে হোথা / দিগ্বলয়ের অরুণ লেখা" ।) পড়ে এর মধ্যে ফারসি কবি হাফেজের "Mysticism"এর ছোঁয়া পেয়েছেন। এই কবিতাটি "প্রবাসী" পত্রিকার ১৩২৬ (১৯১৯) এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল । নজরুল স্বভাবতই এই অপ্রত্যাশিত সুখবরে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন ।

নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতাটি শুধু বাংলাই নয় বিশ্বসাহিত্যেও এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে বলা যায় । ইংরেজ কবি টমাস গ্রে যেমন "এলিজি রিটেন্ ইন্ আ কান্ট্রি চার্চইয়ার্ড" নামের একটা কবিতার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন , নজরুলও যদি শুধু "বিদ্রোহী" কবিতাটিই লিখে যেতেন, তাহলেও বাংলা সাহিত্যে তিনি হয়ত চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন ।

এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় "মোসলেম ভারত" নামের একটি পত্রিকায় , ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে । কিন্তু এর আলোড়নসৃষ্টিকারী আত্মপ্রকাশ ঘটে "বিজলী " পত্রিকার জানুয়ারী ১৯২২ এর সংখ্যায় এর দ্বিতীয় মুদ্রণে । শোনা যায় শুধু এই কবিতাটি পড়ার জন্য দলে দলে মানুষ "বিজলী " অফিসে ভিড় করেছিল পত্রিকাটি কিনতে ! এর আগে ১৯২১এর শেষের দিকে ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন । শহীদুল্লাহ সাহেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় করাতে গিয়ে বলেন যে ট্রেনে শান্তিনিকেতন আসার পথে নজরুল গীতাঞ্জলির গানগুলি একটার পর একটা তাঁকে গেয়ে শুনিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সহাস্য সকৌতুকে এই তথ্যটি শোনেন এবং নজরুলকে বলেন তাঁর নিজের একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে । নজরুল বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর "আগমনী " কবিতাটি আবৃত্তি করেন । বিশ্বভারতীর অতিথি হিসেবে এই দুই রবীন্দ্র-ভক্ত শান্তিনিকেতনে দিন-দুই কাটিয়েছিলেন , এবং হয়ত আরও এক-আধবার গুরুদেবের সাথে তাঁদের সাক্ষাতের সুযোগ হয়ে থাকবে ।

এই চাক্ষুস পরিচয়ের সূত্র ধরেই বোধহয় নজরুল তাঁর "বিদ্রোহী" কবিতাটি "বিজলী" পত্রিকায় প্রকাশিত হবার দু-এক দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে নিজ কণ্ঠে তা পড়ে শোনানোর জন্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে হাজির হন এবং কবিতাটি পড়ে শোনান । প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা জানান, এবং তাঁর ভবিষ্যত সাফল্য কামনা করেন ।

১৯২২এর অগাষ্ট মাসে নজরুল "ধূমকেতু" নামে একটি অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা চালু করেন । রবীন্দ্রনাথের কাছে চেয়ে-পাঠানো আশীর্বাণী আসে এই চিঠিতে ।

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু,

"আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু / আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু / দূর্দিনের এই দুর্গশিরে / উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন । অলক্ষণের তিলকলেখা / রাতের ভালে হোক না লেখা । জাগিয়ে দে রে চমক মেরে / আছে যারা অর্ধচেতন ।"

এই বাণীটি নজরুল ধূমকেতুর শুধু প্রথম সংখ্যাতেই নয়, প্রতিটি সংখ্যায় ছাপতেন । এই পত্রিকাটি ছিল নজরুলের সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত বিপ্লবী চিন্তার ধারক এবং প্রচারমাধ্যম । রবীন্দ্রনাথ তাই একে আশীর্বাদ জানাতে দ্বিধা করেন নি । মজার ব্যাপার হল যে ধূমকেতু পর্ব এখানেই শেষ নয় । একে কেন্দ্র করে ১৯২৩এর জানুয়ারী মাসে রাজদ্রোহীতার অভিযোগে নজরুলের এক বছর জেল হয় । জেলখানার নানাবিধ অব্যবস্থা এবং তাঁকে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে হুগলি জেলে স্থানান্তরিত করার হুকুমনামার প্রতিবাদে নজরুল অনশন শুরু করেন । শিলংএ বসে এই খবর পেয়ে বিচলিত রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে টেলিগ্রাম পাঠান অনশন বন্ধ করার উপরোধ জানিয়ে এই ভাষায় – "give up your hunger strike , our literature claims you."

টেলিগ্রামটি অবশ্য নজরুলের হাতে পৌঁছায় নি কারণ তাঁকে ইতিমধ্যেই হুগলি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষ একজন রাজদ্রোহীকে পাঠানো টেলিগ্রাম নিয়ে মাথা ঘামাতে উদ্যোগী হবেন না এটাই স্বাভাবিক !

কিন্তু নজরুলের এই প্রথম জেলজীবন তাঁর কাছে নিশ্চয় অবিস্মরণীয় হয়ে ছিল অন্য এক অভাবিত ঘটনায় । ১৯২৩এর ফেব্রুয়ারী মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাটিকা "বসন্ত" নজরুলকে উৎসর্গ করেন । প্রাণবন্ত, উচ্ছল যুবক নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় বসন্তের মূর্ত প্রতীক মনে করেই "বসন্ত" নামের রচনাটি তাঁর নামে উৎসর্গ করে থাকবেন । উল্লেখ্য, জীবনে আরও একবার রবীন্দ্রনাথ বসন্তের প্রতীক "ঋতুরাজ" বলে যাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি ছিলেন জওহরলাল নেহেরু ।

তেইশ বছর বয়সের তরুণ কবিকে ষাটোর্ধ নোবেলবিজয়ী কবি-সম্রাট তাঁর নবতম সাহিত্যসৃষ্টি সস্নেহে উপহার দিচ্ছেন এটা নজর-কাড়া ঘটনা বটেই । উৎসর্গের লিপিটুকুও তাৎপর্যপূর্ণ – "শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু" । নজরুল-সুহৃৎ পবিত্র গাঙ্গুলীও রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন ছিলেন । তাঁরই মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ "বসন্ত"এর একটি কপি নিজের হাতে লেখা উৎসর্গ-লিপি সমেত পাঠান আলিপুর জেলে । পবিত্র গাঙ্গুলী নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের এই "কবি" সম্বোধন নজরুলের "কবি-স্বীকৃতি" বলে বর্ণনা করেছেন । নজরুলের তরুণ বয়সের এই অসামান্য খ্যাতির অন্যতম ফলশ্রুতি হয়েছিল ঈর্ষান্বিতদের নিন্দাবাদ । তাঁর নানা কবিতার স্থূল প্যারোডি কলকাতার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত প্রায়ই । রবীন্দ্রনাথকেও এই ধরণের নিন্দা সহ্য করতে হয়েছে , এমন কি তাঁর পরিণত বয়সেও । হয়ত তাই তিনি নজরুলকে সর্বজন সমক্ষে এই কবি-স্বীকৃতি দেন নিন্দুকদের প্রতি প্রচ্ছন্ন সাবধান বাণী হিসেবে ।

পবিত্র গাঙ্গুলী বইটি নজরুলকে পৌঁছে দিতে গিয়ে নজরুলের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বিমূঢ় হয়ে যান । নজরুল বইটি বুকে ধরে উল্লাসে এমন নৃত্য করতে শুরু করেন যে জেলের অনেক কর্মচারী কি ব্যাপার দেখতে দৌড়ে আসেন ! নজরুল পরে এ কথাও বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের ওই সস্নেহ উৎসর্গবাণী তাঁকে জেলজীবনের দুঃখ-জ্বালা সহ্য করতে সাহায্য করেছিল । অনেকে মনে করেন যে নজরুল তাঁর বিখ্যাত কবিতা "আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে" র অনুপ্রেরণাও এই বাণী থেকে পেয়েছিলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনও বই নিজের পারিবারিক-বলয়ের বাইরে কাউকে উৎসর্গ করেন । এর পরে যাঁদের তিনি অন্যান্য বই উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র , দেশনায়ক নেতাজী সুভাষ , অধ্যাপক সত্যেন বসু প্রমুখ দিক্‌পালেরা ।

১৯২৫ সালে নজরুলের রাজনৈতিক গুরু-স্থানীয় নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মারা যান । তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ পার্টির বাম-ঘেঁষা একটি গোষ্ঠী শ্রমিক-স্বরাজ পার্টি নাম নিয়ে "লাঙ্গল" নামে একটি পত্রিকা চালু করেন নজরুলের পরিচালনায় । আবারও নজরুল রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হন আশীর্বাণীর আব্দার নিয়ে । রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিরাশ করেন না, লিখে পাঠান – "জাগো, জাগো বলরাম -- ধর তব মরুভাঙ্গা হল / প্রাণ দাও, শক্তি দাও / স্তব্ধ কর ব্যর্থ কোলাহল ।।" এই পত্রিকাটি পরে নাম পাল্টে "গণবাণী" নামে বেশ কয়েক বছর চলেছিল এবং নজরুলের সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল ।

ইতিমধ্যে ১৯২৪ সালে নজরুলের বিয়ে হয় কুমিল্লারই আরেক কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তর সঙ্গে । এঁর মা বিরজাসুন্দরী দেবীকে নজরুল "গুরু-মা" বলে সম্ভাষণ করতেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে "মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)র শ্রীচরণারবিন্দে --" নামের শ্রদ্ধাবেগাপ্লুত কবিতাটি রচনা করেছিলেন ১৯২৬ সালে ।

সাহিত্য এবং সঙ্গীতসাধনায় নজরুলের বিশ এবং ত্রিশের দশক অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটে ঠিকই, কিন্তু অর্থকষ্ট এবং দারিদ্র তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে । একদিকে প্রকাশকদের প্রায়শ-বঞ্চনা, অন্যদিকে বন্ধুবান্ধবের নিঃস্বার্থ বদান্যতা ছিল নজরুলের দৈনন্দিন জীবনের পাথেয় স্বরূপ । এই নিত্য অর্থকষ্ট থেকে কিছুটা মুক্তি দেওয়ার অভিপ্রায়েই তাঁর বন্ধু মহম্মদ নাসিরউদ্দিন নজরুলকে তাঁর বহুল-প্রচলিত "সওগাত" পত্রিকায় নিয়মিত বেতনের একটা সাংবাদিকতার কাজ দেন ১৯২৫ সালে । এই পত্রিকায় ইতিপূর্বেই নজরুল তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশ করেছেন । সাম্প্রদায়িকতামুক্ত উদার সামাজিক চিন্তার প্রসারে এবং বাংলার নারীজাগরণের ক্ষেত্রে এই পত্রিকাটির অবদান অবিস্মরণীয় । বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, কামিনী রায় এবং মানকুমারী বসুর মত মুক্তমনা মহিলা সাহিত্যিকেরা এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন । নাসিরউদ্দিন সাহেবের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথও "পথের সাথী" নামে একটি সুন্দর এবং অর্থবহ কবিতা এই পত্রিকার জন্য লিখেছিলেন । তিনি পত্রিকাটির "সওগাত" ("উপহার") নামকরণ নাসিরউদ্দিন সাহেবের সুরুচির পরিচয় বলে প্রশংসা করেছিলেন ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের পত্রবিনিময় নিয়মিত চলতে থাকে, এবং কখনও-সখনও দেখা-সাক্ষাতও । ১৯২৮ সালে নজরুল তাঁর কবিতাসংগ্রহ "সঞ্চিতা" প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে – "বিশ্বকবিসম্রাট শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রী শ্রী চরণারবিন্দেষু" ।

১৯২৯ সালে কলকাতায় ৩০ বছরের যুবক নজরুলকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানানো হয় "সওগত" পত্রিকা গোষ্ঠীর উদ্যোগে এবং বিজ্ঞানী প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে । সাহিত্যিক এবং ব্যারিস্টার এস্ ওয়াজেদ আলী সম্বর্ধনা লিপিটি পাঠ করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না , কিন্তু তাঁর সম্মতি এতে ছিল । (নেতাজী) সুভাষ চন্দ্র নিজে উপস্থিত থেকে নজরুলকে অভিনন্দন জানান ।

১৯৩০এর দশকে নজরুল কলকাতার মঞ্চ-নাটক এবং সিনেমার জগতে প্রবেশ করেন বিভিন্ন ভূমিকায় । কখনও চিত্রনাট্য লেখায়, কখনও সঙ্গীত পরিচালক এবং গীতিকার হিসেবে, কখনও বা অভিনয়ে । ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথের "গোরা" উপন্যাস সিনেমার পর্দায় আসে , সঙ্গীত পরিচালক নজরুল । কথিত আছে যে বিশ্বভারতীর কয়েকজনের আপত্তি সত্ত্বেও নজরুল এই দায়িত্ব পান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় ।

১৯৩০ সালে নজরুলের শিশুপুত্র বুলবুল মারা যায় । অর্থকষ্টের সঙ্গে এই শোকও নজরুলের সৃজনীশক্তিকে দমাতে পারে নি । তিনি অসুস্থ শিশুর সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে কবি হাফেজের ফারসি রচনার বাংলা অনুবাদের কাজ করে যাচ্ছিলেন । ১৯৩১ সালে "বর্ষবাণী" পত্রিকার সম্পাদক জাহানারা বেগম নজরুলকে কিছুদিন বিশ্রাম দেওয়ার জন্য দার্জিলিং নিয়ে যান । ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর পরিবারের কয়েকজন সমেত দার্জিলিংএ ছিলেন । নজরুল কবির সঙ্গে দেখা করতে যান কয়েকবার । প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন যে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ নজরুলের সান্নিধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তেন । তিনি নিজে এবং তাঁর বহু গানের সুরকার ভাইপো দীনেন্দ্রনাথ নজরুলের সঙ্গে সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন । নজরুলের আরবীয় এবং পারসিক সঙ্গীতধারার সাথে পরিচিতি ছিল । এদের সঙ্গে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের তুলনামূলক আলোচনায় এই তিন সঙ্গীতসাধক দার্জিলিংএর মনোরম পরিবেশে মেতে উঠেছিলেন হয়ত । রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখেন , কিন্তু নজরুল বোধহয় আর কখনও শান্তিনিকেতন গিয়ে উঠতে পারেন নি ।

সাংবাদিক নজরুল তাঁর সব পত্রিকাকেই রবীন্দ্রনাথের স্পর্শধন্য করতে চেয়েছেন । ১৯৩৫ সালে "নাগরিক" পত্রিকার জন্য উপরোধ পৌঁছল অসুস্থ কবির কাছে । তিনি বয়স এবং অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন এমন একটি স্নেহমাখা চিঠিতে যে আবেগাপ্লুত নজরুল "তীর্থপথিক" নামে একটি কবিতার মাধ্যমে কবির কাছে মার্জনা ভিক্ষা করলেন । কবিতাটির প্রথম দুই লাইন এই রকম – "হে কবি, হে ঋষি অন্তর্যামী / আমায় করিও ক্ষমা । পর্বতসম শত দোষত্রুটি ও চরণে হল জমা ।।"

নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই সুরসিক মানুষ ছিলেন এ কথা তাঁদের লেখা এবং কথোপকথনের মধ্যে দেখা যায় । তাই নজরুল তাঁর গুরুদেবটিকে শুধু যে শ্রদ্ধা নিবেদনই করতেন তা নয়, অনেক সময় তাঁকে নিয়ে তামাশা করতেও ছাড়তেন না । একবার নজরুলের কানে এল যে রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন "সাহেব" অতিথিদের সঙ্গে

খাওয়া দাওয়া করেছেন। নজরুল লিখলেন "কালোতে ধলোতে মিলেছে ভাল / মন্দ-মধুর হওয়া। আমি দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন ডিনার খাওয়া।" ইংরেজ শাসকের জেলখানা ব্যবহারের ঘটা দেখে নজরুল লিখলেন "তোমারই জেলে পালিছ ঠেলে / তুমি ধন্য ধন্য হে"। আরেকবার নজরুল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। প্রথা মত পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে বলে উঠলেন নিজেরই একটি কবিতার প্যারোডি করে "দে গুরুর পা ধুইয়ে" !

১৯৩০এর শেষার্ধ বাংলা, ভারত তথা সারা বিশ্বের রাজনৈতিক জগতের এক উত্তাল সময়। ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি শুরু হয় এই সময় থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি যা আগেই শুরু হয়েছিল ইউরোপ এবং জাপানে, তার করাল ছায়া বাংলা ও ভারতেও পড়তে শুরু করে এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগের সম্ভাবনাও আলোচিত হতে শুরু করে। রবীন্দ্রনাথের শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে মানসিক উদ্বেগও বাড়তে থাকে। তিনি হিন্দু-মুসলমানের এই ক্রমবর্ধমান বিভেদ যে জাতির চরম বিপদের কারণ হবে এটা বুঝে রাজনৈতিক নেতাদের এবং দেশের সাধারণ মানুষকে সাবধান করার চেষ্টা করেন বিভিন্নভাবে। ত্রিশের দশকেই তিনি "কালান্তর" গ্রন্থে মুসলমান প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করেন; রচনা করেন তাঁর "মুসলমানীর গল্প" নামের বিখ্যাত ছোট গল্পটি।

নজরুল ইতিমধ্যে কিছুটা আর্থিক সাচ্ছল্য অর্জন করেছেন, এবং সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীত ও অভিনয়ের জগতে জড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙ্গে পড়তে থাকে। ১৯৩০এর দশক নজরুলের সাহিত্য জীবনের সবচেয়ে ফলপ্রসূ সময় বলা যায়। তাঁর অনেক লেখাতেই তিনি হিন্দু-মুসলিম বিভেদের বিরুদ্ধে লিখেছেন এবং এর কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর উদার জীবনদর্শন এবং ধর্মীয় সহনশীলতার বার্তা এক দিকে যেমন তাঁকে সুশীল সমাজে জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল, অন্য দিকে তেমনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে, রক্ষণশীল সমাজ তাঁকে নিষ্ঠুর সমালোচনায় জর্জরিত করে তুলেছিল। তিনি এক সময় এই ধরণের মনোবৃত্তিকেই "জাতের নামে বজ্জাতি" বলে তিরস্কার করেছিলেন।

১৯৩৮ সালে নজরুলের স্ত্রী প্রমীলা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হয়ে যান। তাঁর চিকিৎসার জন্য নজরুলকে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে হয়। তিনি নিজেও নানা ভাবে শারীরিক অস্বস্তি ভোগ করছিলেন। তাঁর কথায় অসংলগ্নতা এবং জড়তা লক্ষ্য করছিলেন বন্ধু-বান্ধবরা, কিন্তু তিনি এগুলি গ্রাহ্য না করে পারিবারিক কর্তব্য পালনে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

১৯৪১ সালে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ তাঁর অশীতিতম জন্মদিন পালন করেন এবং মানবজাতির, মনুষ্যত্বের প্রতি তাঁর চিরন্তন বিশ্বাস জানিয়ে যান "সভ্যতার সঙ্কট" প্রবন্ধের মাধ্যমে। নজরুল কবির জন্মদিন ২৫শে বৈশাখে তাঁকে অভিনন্দন জানান "অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি" নামে একটি সুন্দর কবিতার মাধ্যমে, যার শুরুটি এই ভাবে – "চরণারবিন্দে লহ অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি / হে রবীন্দ্র, তব দীন ভক্ত এ কবির। অশীতি বার্ষিকী তব জন্ম উৎসবে / আসিয়াছি নিবেদিতে নীরব প্রণাম ।।"

২২শে শ্রাবণের মেঘলা দিনে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কর্মময় জীবনের অবসান হয়। নজরুল প্রায় পিতৃহারা হয়ে যান। তাঁর অনুজপ্রতিম বন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের অন্যতম রাষ্ট্রপতি আবু সৈয়দ চৌধুরী নজরুলকে শোকে মুহ্যমান এবং বাক্যহারা অবস্থায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন। নজরুল ওই দিনেই তাঁর রবীন্দ্রপ্রয়াণের প্রথম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন "রবিহারা" কবিতার মাধ্যমে। অল ইন্ডিয়া রেডিওর আমন্ত্রণে নজরুল কবিতাটি সারা বাংলার শ্রোতাদের জন্য আবৃত্তি করেন। এর পর আরও দুটি কবিতা নজরুল সদ্যপ্রয়াত রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন যেগুলির নাম "সালাম অস্তরবি" এবং "ঘুমাইতে দাও ক্লান্ত রবিরে"।

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে যায়। এর পরের অধ্যায় অবশ্যই আরও করুণ। নির্বাক, মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় কবি দীর্ঘ ৩৪ বছর কাটিয়ে ১৯৭৬ সালে মারা যান।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দুই দশকের সম্পর্ক ছিন্ন হয় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে। কিন্তু তাঁর নিজের জীবনের যে করুণ পরিণতি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে নেমে আসে তা ছিল নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। ধর্মীয় এবং সামাজিক সকল কুসংস্কারের ঊর্ধে থেকে এই অসমসাহসী মানুষটি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী এবং সমস্ত বঞ্চিত সর্বহারা মানুষের নিতান্ত আপনজন। এই বিচারে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন বলা যায়।

(লেখকের বক্তব্য -- আমি সাহিত্যিক নই, ভাষাবিদ্ নই, এমন কি সাহিত্যের ছাত্রও নই। আমার পেশা অর্থনীতির অধ্যাপনা। বাংলা আমার মাতৃভাষা বটে , কিন্তু আমি চার দশকের ওপর বাংলার বাইরে বসবাস করছি। তাই দৈনন্দিন জীবনে বাংলা ভাষার ব্যবহারও আমার সীমিত। তা সত্ত্বেও যে এই প্রবন্ধটি লেখার উচ্চাকাঙ্খা হল তার কৈফিয়ত এই যে আমি রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের ভক্ত। এঁদের জীবনদর্শন এবং সাহিত্য অনেক বাংলা ভাষাভাষীর মত আমাকেও আনন্দ এবং শান্তি দেয়। তাই এঁদের সম্বন্ধে গুণীজনের লেখা হাতে এলে তা সংগ্রহ করে রাখার একটা অভ্যাস অনেক দিন ধরেই আছে। সেই সব সংগ্রহের ওপর এবং নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করেই এই প্রবন্ধটি লিখলাম। পাঠকদের মধ্যে অনেকেই আমার চেয়ে এই দুই কবির সম্বন্ধে বেশী জানবেন , আমি তাঁদের কাছে মার্জনা চাইছি।) ❑